মানব পাচার প্রতিরোধে সম্মিলিত প্রয়াস

সেলিনা আক্তার

সভ্যতা বিবর্জিত জঘন্য অপকর্ম ‘মানব পাচার’ একটি সামাজিক ব্যাধি। যখন কোনো ব্যক্তি ধর্ম-কর্ম ভুলে আরেক ব্যক্তিকে দেশান্তর করে, তাকে স্বাধীনভাবে চলতে না দিয়ে, জবরদস্তি করে শ্রম দিতে বা পতিতাবৃত্তি করতে বাধ্য করে, তার ওপর যৌন নির্যাতন বা শ্লীলতাহানি করে অথবা মারধর, আঘাত বা অন্য কোনো রকম শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করে ক্ষতি সাধন করে, তা-ই হচ্ছে ‘মানব পাচার’।

মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার বাসিন্দা মো. বিল্লাল হোসেন। উন্নত জীবনের আশায় ইতালি যাওয়ার জন্য দালালের হাতে তুলে দেন জমি বিক্রির মোটা অঙ্কের টাকা। কিন্তু ইতালির পরিবর্তে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় লিবিয়ায়। সেখানে পৌঁছানোর পর বন্দি করে তাকে নিয়মিত নির্যাতন করা হতো। সেই সঙ্গে অপহরণকারীরা দেশে থাকা তার পরিবারকে নির্যাতনের ভিডিও দেখিয়ে আরও টাকা দেওয়ার জন্য চাপ দিত। টাকা না পেলে বিল্লালকে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। এক পর্যায়ে চোখ বেঁধে বিল্লালকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। লিবিয়ার উপকূলরক্ষীরা বিল্লালকে উদ্ধার করে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) সহায়তায় দেশে ফেরেন তিনি।

প্রতিবছর অনেক নারী ও শিশু পাচারের শিকার হয়। কতজন মানুষ পাচার হয়, তা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। কারণ পাচার গোপনে সংঘটিত হয়। পাচারকৃত ব্যক্তির সংখ্যা নিয়ে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক পরিসংখ্যান রয়েছে। জাতিসংঘের মতে, প্রতিবছর সারাবিশ্বে প্রায় ৪ মিলিয়ন মানুষ পাচার হয়ে থাকে। মানব পাচারের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। মানব পাচারকে দাসত্বের আধুনিক রূপ বলে মনে করা হয়। অর্থ উপার্জনের সহজ মাধ্যম হিসেবে কিছু লোক মানব পাচারের মতো ঘৃণ্য কাজকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। মানবপাচার বিষয়ক মার্কিন প্রতিবেদন ইউএস ট্রাফিকিং ইন পারসনস (টিআইপি) রিপোর্টে বলা হয়েছে, মানবপাচার নির্মূলে ন্যূনতম যেসব ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, বাংলাদেশ সরকার সেগুলো পুরোপুরি করতে পারছে না, যদিও তা করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ উন্নত জীবনযাত্রার খোঁজে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমাচ্ছে। কিন্তু তাদের অনেকেরই এ যাত্রার শেষ পরিণতি হয় মানব পাচারের শিকার হয়ে। বিশ্বব্যাপী দ্রুত বর্ধনশীল সংঘবদ্ধ অপরাধগুলোর মধ্যে মানব পাচার অন্যতম। বিগত বছরগুলোয় বাংলাদেশেও মানব পাচারের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। দেশ থেকে মানব পাচারের ঘটনা সরকারি নথিপত্রেও উঠে এসেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের হিসেব অনুযায়ী, ২০১৯ থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত মানব পাচারের অভিযোগে মামলা হয়েছে মোট ৪ হাজার ৫৪৬টি। আসামি করা হয়েছে ১৯ হাজার ২৮০ জনকে। বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে সাজা হয়েছে কেবল ১৫৭ জনের। এর মধ্যে ২৪ জনের যাবজ্জীবন ও ১৩৩ জনকে দেওয়া হয়েছে অন্যান্য মেয়াদে সাজা। অর্থাৎ ১ শতাংশেরও কম বিচারের আওতায় এসেছেন। এসব মামলায় গুরুতর অভিযোগ থাকলেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কোনো নজির নেই। এর বিপরীতে গত ছয় বছরে মানব পাচারের মামলায় খালাস পেয়েছেন ৩ হাজার ১৪১ জন। সবচেয়ে বেশি আসামি খালাস পেয়েছেন ২০২৩ ও ২০২৪ সালে।

দারিদ্র্যকে মানব পাচারের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, যেসব দেশ থেকে পাচার হয় তার অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে। এ অবস্থায় তাদের কাছে একটি ভালো জীবনের প্রতিশ্রুতি সেটা যতই অবাস্তব হোক না কেন, তা পাচারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। কিছু ব্যক্তি তাদের চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্য পাচারের মতো ক্ষতিকর পরিস্থিতিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। পাচারকারীরা এই সুযোগটি গ্রহণ করে। মানব পাচার ও অবৈধ অভিবাসনের কারণে বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেয়া বন্ধ করেছে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার অনেক দেশ। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) তথ্য অনুযায়ী, গত ১২ বছরে ওমান, বাহরাইন, ইরাক, লিবিয়া, সুদান, মিশর, রোমানিয়া, ব্রুনাই ও মালদ্বীপ বাংলাদেশের কর্মীদের জন্য শ্রমবাজার বন্ধ করে দিয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ মালয়েশিয়া সিন্ডিকেট বাণিজ্যের কারণে বাংলাদেশি কর্মী নেয়া বন্ধ করেছে প্রায় এক বছর। বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় মানব পাচার হচ্ছে—এমন গুরুতর অভিযোগ উঠে আসে যুক্তরাষ্ট্রের মানব পাচারসংক্রান্ত ‘ট্রাফিকিং ইন পারসনস রিপোর্ট’ শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদনে।

বাংলাদেশ থেকে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় মানব পাচারের মতো অপরাধের মাত্রা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। স্থানীয় বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে নাজুক অবস্থানে থাকা ব্যক্তিরা এর শিকার হচ্ছেন। বিদেশে উন্নততর জীবনযাপনের প্রত্যাশায় থাকা অভিবাসনপ্রত্যাশীরাও দালালের খপ্পরে পড়ছেন নিয়মিত। এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে নৌপথে মানব পাচারের বড়ো রুট এখন কক্সবাজার। স্থলপথে নারী ও শিশু সবচেয়ে বেশি পাচার হয় যশোর দিয়ে। আবার ময়মনসিংহ থেকে সোমেশ্বরী নদী পেরিয়ে মানব পাচারের তথ্যও এখন সামনে আসছে। এর মধ্যে ইউরোপে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মধ্যপ্রাচ্য হয়ে নিয়ে যাওয়া হয় লিবিয়ায়। সেখান থেকে নৌকায় করে ইউরোপ অভিমুখে উত্তাল ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে মৃত্যু হয় অনেকের।বাংলাদেশ থেকে নৌপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোয় পাচার হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের বড়ো একটি অংশকে এখন বিভিন্ন শিল্পে শ্রমদাস হিসেবে বা রেড লাইট এরিয়ায় বিক্রি করে দেওয়ার ঘটনা ঘটছে অনেক। গ্লোবাল অর্গানাইজড ক্রাইম ইনডেক্সের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে মানব পাচারই এখন সবচেয়ে বড়ো আন্তঃসীমান্ত অপরাধ। সংস্থাটির সর্বশেষ প্রকাশিত আন্তঃদেশীয় অপরাধ সূচকে মানব পাচারের ভয়াবহতার ১০ পয়েন্টে বাংলাদেশের সূচক মান ৮। সংস্থাটির হিসেবে বাংলাদেশ থেকে মানব পাচার বেড়ে যাওয়ার পেছনে অন্যতম প্রধান অনুঘটক হয়ে উঠেছে রোহিঙ্গা সংকট।

পাচারকারীরা কক্সবাজার উপকূলের বেশ কয়েকটি পয়েন্ট ব্যবহার করছে। এগুলো হলো টেকনাফের শামলাপুর, শীলখালী, রাজারছড়া, নোয়াখালীপাড়া, জাহাজপুরা, শাহপরীরদ্বীপ, কাটাবনিয়া, মিঠাপানির ছড়া, জালিয়াপালং, ইনানী, হিমছড়ি, রেজুখাল, কুতুবদিয়াপাড়া, কক্সবাজার শহরের খুরুশকুল, চৌফলদি ও মহেশখালীর সোনাদিয়া, কুতুবজোম। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাসহ বেশ কয়েকজন রোহিঙ্গা নেতা। এ রোহিঙ্গা নেতাদের সবাই টেকনাফের বিভিন্ন ক্যাম্পের বাসিন্দা। এছাড়া মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বেশ কয়েকজনও এখন মানব পাচারকারী চক্রের সঙ্গে জড়িত। সাম্প্রতিক সময়ে পুলিশ, বিজিবি ও কোস্টগার্ড নিয়মিত অভিযান পরিচালনা চালিয়ে অনেক দালাল ও ভিকটিমকে আটক করেছে।

মানব পাচার কিংবা সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে সরকার সবসময় সোচ্চার। এমনকি এ বিষয়ে বিভিন্ন জায়গায় অভিযানও পরিচালনা করছে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা। মানব পাচার প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করছে।অপরাধ প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ২০১৭ সালে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক প্রটোকলে অনুসমর্থন দিয়ে তার আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। মানব পাচার প্রতিরোধে বাংলাদেশের কার্যক্রমগুলোকে ভুক্তভোগী-সহায়ক করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে নারী-পুরুষ বা তরুণ-বয়স্ক সব ভুক্তভোগী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেবা পায়। এর অর্থ হলো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও দাতাগোষ্ঠীর ব্যাপক প্রচেষ্টার সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে ভুক্তভোগীদের সেবা জোরদার করা জরুরি। সেই সঙ্গে ভুক্তভোগীদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা, চিকিৎসা এবং মানসিক, সামাজিক, আইনি ও পুনর্বাসনসেবাও নিশ্চিত করতে হবে।

বৈশ্বিক অভিবাসীর উৎস তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ষষ্ঠ। কর্মসংস্থানের জন্য প্রতিবছর বিদেশে পাড়ি দেন গড়ে অন্তত ১০ লাখ মানুষ। এ মানুষগুলোর জীবনের নিরাপত্তা দেওয়া সরকারেরই দায়িত্ব। দালাল চক্র যেন অবৈধ পথে কর্মী পাঠানো, মানব পাচারের মতো অপরাধ করতে না পারে সেজন্য কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে এসব অপরাধ রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে ঘটতে দেখা যায়। সুতরাং সিন্ডিকেট, রিক্রুটিং এজেন্সি, দালাল—সবার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা প্রয়োজন। যাতে ভবিষ্যতে মানব পাচারের নতুন কোনো সক্রিয় সিন্ডিকেট তৈরি না হয়। পাশাপাশি বহির্বিশ্বে অভিবাসনখাতে দেশের ভাবমূর্তি ফেরানো প্রয়োজন।

মানব পাচার নির্মূলে বাংলাদেশের যেসব দুর্বলতা রয়েছে, সেগুলো কাটিয়ে উঠতে জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশ্লেষকরা বলছেন, পেনাল ল, পুলিশ অ্যাক্ট, সিআরপিসি, এভিডেন্স অ্যাক্ট হয়েছিল মূলত লুণ্ঠন, শোষণ ও নিষ্পেষণের জন্য। এ আইনে যারা পাচারকারী চক্রের মূল হোতা তাদের সাজা হয় না। সাজা হয় শুধু মানব পাচার চেইনের মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকা পাচারকারী বা দালালদের। তাই মানব পাচার আইনকে আরও যুগোপযোগী করে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। যাতে মূল অপরাধীদের বিরুদ্ধে শক্তভাবে ব্যবস্থা নেয়া যায়।

মানব পাচার ও প্রতিরোধ দমন আইন, ২০১২ অনুসারে সরকার মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ, উদ্ধার প্রত্যাবাসন এবং পুনর্বাসনকল্পে সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে অংশীদারত্বে কাজ করবেন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিশেষত নারী ও শিশুদের কল্যাণ ও বিশেষ চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখবেন। কোনো বাংলাদেশি নাগরিক অন্য কোনো দেশে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হলে সরকার সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের এবং প্রয়োজনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় উক্ত ব্যক্তিকে বাংলাদেশে ফেরত আনার ব্যবস্থা করবেন। বিদেশি রাষ্ট্রে মানব পাচারের শিকার কোনো ব্যক্তি বিদেশি রাষ্ট্রে থাকতে বাধ্য হলে বাংলাদেশ দূতাবাস ওই ব্যক্তিকে আইনি পরামর্শ বা সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। অনুরূপভাবে কোনো বিদেশি নাগরিক বাংলাদেশে মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হলে সরকার সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের দূতাবাসের সহযোগিতায় উক্ত ব্যক্তিকে তার স্বদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন।

২০২৬–৩০ সময়কালের জন্য চতুর্থ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাজ করছে। এছাড়া বিভাগীয় পর্যায়ে সাতটি মানব পাচার ট্রাইব্যুনাল ইতোমধ্যে গঠন করা হয়েছে। বিচার প্রক্রিয়ার গতি বাড়াতে এসব ট্রাইব্যুনাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা মাথায় রেখে সরকার একটি জাতীয় রেফারেল ব্যবস্থা গঠনের কাজ করছে, যাতে পাচার থেকে ফিরে আসা ভুক্তভোগীরা পূর্ণ সহযোগিতা, সেবা ও পুনর্বাসনের সুযোগ পান। পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও দক্ষ করে গড়ে তোলার মাধ্যমে তদন্ত, বিচার ও সাক্ষী সুরক্ষার বিষয়েও নজর দেওয়া হচ্ছে।

পাচারের মতো সমস্যা ও তার প্রতিকার কোনো ব্যক্তি বা বাহিনীর পক্ষে এককভাবে সমাধা করা সম্ভব নয়, এ ক্ষেত্রে সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। সরকারের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিভিন্ন বেসরকারি সামাজিক সংগঠনসহ সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণকে একত্রিত ও উদ্বুদ্ধ করে মানব পাচারকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তুলে কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে হবে। নারী ও শিশু পাচার রোধ করার জন্য বর্তমান সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তবে পাচার প্রতিরোধে সবার আগে প্রয়োজন সচেতনতা।

#

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

পিআইডি ফিচার